ধারাবাহিক রচনা

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের ইতিবৃত্ত

স্বামী চেতনানন্দ

দক্ষিণেশ্বরে শেষ জন্মোৎসব—১৮৯৭

১৮৯৭ সালে আলমবাজার মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালিত হয় শুক্রবার ৫ মার্চ এবং দক্ষিণেশ্বরে শেষ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ৭ মার্চ। স্বামী বিবেকানন্দ উৎসবে যোগদান করবেন এই সংবাদ 'ইন্ডিয়ান মিরর' ও অন্যান্য পত্রিকায় বের হয় এবং পথে পথে বড় পোস্টারে ঘোষিত হয়। ঠাকুরের উৎসবে যোগদান করবার জন্য স্বামীজী তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যদের নিয়ে মাদ্রাজ থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী কলকাতায় পৌঁছন এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁকে কলকাতায় অভিনন্দন দেওয়া হয়। তারপর ৭ মার্চ ঠাকুরের উৎসবে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যান।

স্বামী প্রভানন্দ লিখেছেন,

''ভক্ত রামদয়াল চক্রবর্তী আহিরীটোলা থেকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি পর্যন্ত যাত্রী বহনের জন্য ঐদিন স্টীমার ভাড়া নিয়েছিলেন। মন্দির-প্রাঙ্গণের দক্ষিণপ্রান্তে যেসব সারি সারি ঘরে খাজাঞ্চির অফিস ও কর্মচারীদের বাসস্থান ছিল সেখানে রান্নার ভাঁড়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভোগরান্নার ব্যবস্থা হয়েছিল ঐ সারিবদ্ধ ঘরগুলির পিছনে দরমা-ঘেরা স্থানে। সকাল থেকে দলে দলে লোক আসছিল। হেঁটে, ঘোড়ার গাড়িতে, নৌকায়, স্টীমারে চেপে লোকে উৎসবে যোগদান করছিল। বহু সঙ্কীর্তনের দল নৃত্য ও গানে মাতোয়ারা হয়ে উৎসবক্ষেত্রে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাবের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। বৃহৎ কালীবাড়ির সর্বত্র লোকে লোকারণ্য হয়েছিল, যা ইতঃপূর্বে কখনো হয়নি।''[৫৩]

প্রত্যক্ষদর্শী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে লিখেছেন,

''স্বামীজী তাঁহার কয়েকজন গুরুভ্রাতাসহ বেলা ৯টা-১০টা আন্দাজ উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার নগ্ন পদ, শীর্ষে গৈরিকবর্ণের উষ্ণীষ। জনসঙ্ঘ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে—তাঁহার সেই অনিন্দিত রূপ দর্শন করিবে, সেই পাদপদ্ম স্পর্শ করিবে এবং তাঁহার শ্রীমুখের সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখাসম বাণী শুনিয়া ধন্য হইবে বলিয়া। তাই আজ আর স্বামীজীর তিলার্ধ বিশ্রামের সময় নাই। মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে অসংখ্য লোক। স্বামীজী শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শির অবনত হইল। পরে রাধাকান্তজীউকে প্রণাম করিয়া তিনি এইবার

ঠাকুরের বাসগৃহে আগমন করিলেন। সে প্রকোষ্ঠে এখন আর তিলমাত্র স্থান নাই। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে কালীবাড়ির দিঙ্‌মুখসকল মুখরিত হইতেছে। শত সহস্র দর্শককে ক্রোড়ে করিয়া বার বার কলিকাতা হইতে হোরমিলার কোম্পানীর জাহাজ যাতায়াত করিতেছে। নহবতের তানতরঙ্গে সুরধুনী নৃত্য করিতেছেন। উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা, ধর্মপিপাসা ও অনুরাগ মূর্তিমান হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণরূপে ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছে। এবারকার এই উৎসব প্রাণে বুঝিবার জিনিস—ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে!

''পঞ্চবটীর একপার্শ্বে ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের সমাবেশ হইয়াছিল। গিরিশবাবু পঞ্চবটীর উত্তরে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-গুণগানে ও কথাপ্রসঙ্গে আত্মহারা হইয়া বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে বহুজনসমভিব্যাহারে স্বামীজী গিরিশবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া 'এই যে ঘোষজ!' বলিয়া গিরিশবাবুকে প্রণাম করিলেন। গিরিশবাবুও তাঁহাকে করযোড়ে প্রতি-নমস্কার করিলেন। গিরিশবাবুকে পূর্ব কথা স্মরণ করাইয়া স্বামীজী বলিলেন, 'ঘোষজ, সেই একদিন আর এই একদিন।' গিরিশবাবুও স্বামীজীর কথায় সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, 'তা বটে; তবু এখনও সাধ যায় আরও দেখি।'

''সেদিন দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ির সর্বত্রই একটা দিব্যভাবের বন্যা ঐরূপে বহিয়া যাইতেছিল; এইবার সেই বিরাট জনসঙ্ঘ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও স্বামীজী লোকের কলরবের অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতে পারিলেন না। অগত্যা বক্তৃতার উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া তিনি আবার ইংরেজ মহিলা দুইটিকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের সাধনস্থান দেখাইতে ও শ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত ও অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে লাগিলেন। ইংরেজ মহিলারা ধর্মশিক্ষার জন্য তাঁহার সঙ্গে দূর দেশ হইতে আসিয়াছেন দেখিয়া দর্শকগণের মধ্যে কেহ কেহ আশ্চর্য হইয়া তাঁহার অদ্ভুত শক্তির কথা বলাবলি করিতে লাগিল।

''বেলা তিনটার পর স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'একখানা গাড়ী দ্যাখ—মঠে যেতে হবে।' অনন্তর আলমবাজার পর্যন্ত যাইবার ভাড়া দুই আনা ঠিক করিয়া শিষ্য গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইলে স্বামীজী স্বয়ং গাড়ীর একদিকে বসিয়া এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শিষ্যকে অন্যদিকে বসাইয়া আলমবাজার মঠের দিকে আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, 'কেবল abstract idea (জীবনে ও কার্যে অপরিণত ভাব) নিয়ে পড়ে থাকলে কি হবে? এই সকল উৎসব প্রভৃতিরও দরকার; তবে তো mass-এর ভেতর এই সকল ভাব ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে। এই যে হিন্দুদের বার মাসে তের পার্বণ—এর মানেই হচ্ছে ধর্মের বড় বড় ভাবগুলি ক্রমশঃ লোকের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া।...

''কিন্তু যারা ধর্ম কি, আত্মা কি, এসব কিছুমাত্র বুঝতে পারে না, তারা ঐ উৎসব-আমোদের মধ্য দিয়ে ক্রমে ধর্ম বুঝতে চেষ্টা করে। মনে কর, এই যে আজ ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়ে গেল, এর মধ্যে যারা সব এসেছে তারা ঠাকুরের বিষয় একবারও ভাববে। যাঁর নামে এত লোক একত্রিত হয়েছিল, তিনি কে, তাঁর নামেই বা এত লোক এল কেন—একথা তাদের মনে উদয় হবে। যাদের তাও না হবে, তারাও এই কীর্তন দেখতে ও প্রসাদ পেতেও অন্ততঃ বছরে একবার আসবে আর ঠাকুরের ভক্তদের দেখে যাবে। তাতে তাদের উপকার বই অপকার হবে না।''[৫৪]

ওইদিন স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন মিসেস সেভিয়ার, মিস মুলার ও গুডউইন। স্বামীজী যখন

তাঁদের পঞ্চবটী ও বেলতলা দেখাচ্ছিলেন, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁকে ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে স্বরচিত নিম্নোক্ত স্তোত্রটি দেন—

''অদ্যৈব দেবো ভগবান্ মহাত্মা
শ্রীরামকৃষ্ণঃ পরমেশদেবঃ।
দিষ্ট্যাদিকারুণ্যরসার্দ্রচিত্তঃ
বঙ্গেষু ধন্যং নরজন্ম লেভে।।''

(আজকের এই দিনে মহাত্মা পরমেশ্বর পরমকারুণিক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্গদেশকে ধন্য করে নরকুলে জন্মগ্রহণ করেন।)[৫৫]

স্বামীজী চলতে চলতে সেটি পড়ে শিষ্যের দিকে তাকিয়ে বলেন, ''বেশ হয়েছে, আরও লিখবে।''

প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী শংকরানন্দ ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ সালের স্মৃতিচারণ করেছেন :

''১৮৯৭ সাল, যুগসন্ধির কাল। আমার বয়স তখন সতেরো। সেবার ঠাকুরের উৎসব দক্ষিণেশ্বরে হয়েছিল। আমরা দুই বন্ধুতে মেলা দেখতে বেরিয়েছি। দেখি মানব-স্রোত চলেছে, বিচিত্র কল্লোল, রকমারি গতি, উৎসুক নেত্র, অবিশ্রাম কর্ম এবং জীবনসংগ্রামের প্রতিযোগিতা। মনে হচ্ছে যেন সহস্র বছর পরে গৃহপ্রাচীর ভেঙ্গে অগণিত লোক বেরিয়ে পড়েছে। এক জায়গায় খুব ভীড় জমেছে। উঠতি বয়স, গায়ে বেশ জোর। ভীড় ঠেলে একবারে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। মালসাভোগ। গ্রহীতাদের মধ্যে হৈচৈ ঠেলাঠেলি। বিতরণকারীরা নীরবে কাজ করে চলেছেন। আমি হাত বাড়িয়ে একটা মালসা নিলাম, বন্ধুকেও একটা নিতে বললাম। মুণ্ডিত মস্তক গৈরিকবসন পরিহিত একজন সন্ন্যাসী ধীর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তত্ত্বাবধান করছেন। তাঁর দিকে চোখ পড়তেই মন গিয়ে তাতে লিপ্ত হল। আরও পাঁচ ছয় জন প্রসাদ বিতরণে তৎপর। সন্ন্যাসী-প্রবরের নামধাম জানবার ইচ্ছা হল।... এঁর পরনে গেরুয়া। এঁর মাথা দাড়ি কামান। জ্বল্‌জ্বলে বড় বড় চোখ। খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলাম—ইনি স্বামী বিবেকানন্দ।... ফটোতে বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা দেখেছি, কিন্তু এ রকম শান্ত সৌম্য ঋষির মতো কান্তি আর কখন দেখিনি। এই প্রথম বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দকে দেখলাম।

''তারপর আর একবার দেখি বেলুড়ে দাঁয়েদের ঠাকুরবাড়ীতে। এবার শুধু দেখা নয়, পা ছুঁয়ে প্রণামও করেছিলাম। একা একা। সঙ্গে কোন সঙ্গী ছিল না। পরের বছর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহোৎসব। উৎসব দেখা আমার উদ্দেশ্য নয়, বিবেকানন্দকে দেখব, বুঝব, তাঁর দুর্লভ সঙ্গলাভ করব। পরবর্তী জীবনে এই মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষা, আশীর্বাদ আমার জীবনকে সার্থক করেছে।''[৫৬]

প্রত্যক্ষদর্শী যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসী পত্রিকার ১৩৪২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'আমার দেখা লোক' শিরোনামে স্মৃতিকথা লিখেছিলেন। সেখানে ১৮৯৭ সালের শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে স্বামীজীর স্মৃতিচারণ করেন :

''দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে ঁপরমহংসদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে মহাসমারোহ হইবে। বিবেকানন্দ-স্বামীর তথায় আসিবার কথা আছে। স্বামীজী কালীবাড়িতে আসিবেন শুনিয়াই আমি তথায় যাইবার জন্য উৎসুক হইলাম। আমার বয়স্ক পাঁচ-সাতজন সঙ্গী জুটিয়া গেল। সকলে মিলিয়া একখানা নৌকা করিয়া কালীবাড়িতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম যে, সুপ্রশস্ত অঙ্গন লোকে লোকারণ্য।... শুনিলাম যে, স্বামীজী তখনও আসেন নাই, তবে আসিবেন, ইহা নিশ্চিত। আমি বন্ধুবর্গ-সহ নাটমন্দিরে আসিয়া একস্থানে বসিয়া পড়িলাম। নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে একটা ছোট গালিচা পাতা ছিল। শুনিলাম যে, সেই আসন স্বামীজীর জন্য রিজার্ভড রাখা হইয়াছে। আমি

গালিচা হইতে কিছু দূরে বসিয়া রহিলাম। প্রায় দশ মিনিট পরে, বাহিরে হঠাৎ একটা হৈ-হৈ শব্দ উঠিল—'পরমহংস রামকৃষ্ণজীকী জয়', 'স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজকী জয়' ধ্বনিতে সেই প্রাঙ্গণ বার বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বুঝিলাম, স্বামীজী আসিতেছেন।

''মনে করিয়াছিলাম, 'স্বামীজী সন্ন্যাসী, হয়তো ধীরগম্ভীর ভাবে, মৃদু পদক্ষেপে, মন্দিরে আগমন করিবেন। কিন্তু আমার ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া তিনি নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাতে ধীরতা বা গাম্ভীর্যের কোনও লক্ষণই দেখিতে পাইলাম না। উদ্দাম চঞ্চল বালকের মতো যেন অস্থিরভাবে তিনি নাটমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আমরা বাহিরে পদধ্বনি শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। স্বামীজী নাটমন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র, আমরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র মুগ্ধ হইলাম। তেমন উজ্জ্বল আয়ত-লোচন আর কাহারও দেখি নাই। মুখে হাসি। স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে সাধারণত যেরূপ উষ্ণীষ ও আপাদমস্তক আলখাল্লা-পরিহিত মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামীজী ঠিক সেইরূপ পোশাকই পরিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও পাঁচ-সাতজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচ্ছদও স্বামীজীর পরিচ্ছদের অনুরূপ। তাঁহারা বেশ সুশ্রী, উন্নত ললাট, গৌরবর্ণ, দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় তাঁহারা ধার্মিক, বুদ্ধিমান, বিদ্বান। কিন্তু স্বামীজীর চক্ষুর মতো উজ্জ্বল চক্ষু কাহারও দেখিলাম না। স্বামীজীর পার্শ্বে তাঁহাদিগকে যেন একটু নিষ্প্রভ মতো বোধ হইল।

''নাটমন্দিরে প্রবেশ করিয়াই স্বামীজী যাহা করিলেন তাহা দেখিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইলাম, মনে-মনে একটু যে গর্বও অনুভব করি নাই তাহা নহে। স্বামীজীকে দেখিয়া সকলেই করজোড়ে ললাট স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। তিনি এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী সন্ন্যাসীরাও প্রতি-নমস্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময় প্রায় আট-দশ হাত দূর হইতে তাঁহার সহিত দৃষ্টি-বিনিময় হইবামাত্র তিনি আমাকে নমস্কার করিয়াই একেবারে আমার নিকটে আসিলেন। আমার বন্ধুরা মনে করিলেন যে, স্বামীজীর সহিত আমার পূর্ব পরিচয় ছিল। কিন্তু সেই একদিন ব্যতীত আর কখনও তাঁহাকে দর্শন করি নাই। তবে তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য আমার মনে এক-এক সময় প্রবল ইচ্ছা হইত। জানিনা, আমাকে দেখিবামাত্র তিনি আমার সেই প্রবল আগ্রহের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা।

''তিনি উপবেশন করিলে আমরাও উপবেশন করিলাম। তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু কি কথা বলিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি আজ এখানে বক্তৃতা করিবেন কি?' তিনি বলিলেন, 'এ ভীষণ ভিড়ে বক্তৃতা করা অসম্ভব। করিলেও সকলে তাহা হয়তো শুনিতে পাইবে না।' স্বামীজীর সহিত আমার এই প্রথম বাক্যালাপ এবং বোধ হয় ইহাই শেষ। কারণ সেদিন তাঁহার সহিত আর কোনও কথা হইয়াছিল কিনা আমার মনে নাই। স্বামীজী সেই নাটমন্দিরে বোধ হয় কুড়ি মিনিট বসিয়াছিলেন।...

''স্বামীজী নাটমন্দির হইতে বাহির হইয়া গুরুস্থান অভিমুখে অর্থাৎ পরমহংসদেবের অধ্যুষিত কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সমস্ত জনতা সেই দিকে ধাবিত হইল। আমার সঙ্গীরা আর সেই জনতার মধ্যে যাইতে সম্মত না হওয়াতে আমরা বালী প্রত্যাবর্তন করিলাম।''[৫৭]

বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব—১৮৯৮

১৮৯৭ সালে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের

জন্মোৎসবের পর স্বামীজী আবার সেখানে যান ক্ষেত্রীর রাজা অজিত সিংহকে সঙ্গে নিয়ে। সেই দিনটি ছিল ২১ মার্চ ১৮৯৭। কুমুদবন্ধু সেন উদ্বোধনের ৬২ বর্ষের ৯ সংখ্যায় তাঁদের শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাভূমি দর্শনের বর্ণনা করেছেন :

''যখন দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলাম, তখন স্বামীজী ও মহারাজা অজিত সিং তাঁহার সেক্রেটারী-সহ কালীমন্দির ও রাধাকান্তের মন্দির দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের অভিমুখে যাইতেছেন। আমি ও মাষ্টার মহাশয় তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত। যে ছোট খাটে ঠাকুর বসিতেন তাহাও পুষ্পমালায় সুশোভিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল-দাদা প্রভৃতিও তথায় প্রবেশ করিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই স্বামীজী ঐ ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লুটাইয়া গড়াগড়ি দিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রীর মহারাজা পর্যন্ত দ্বার-সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। কেহই ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সাহস করিলেন না। স্বামীজী এই প্রকার তিনবার গড়াগড়ি দিয়া লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিলেন। পরে যুক্তকরে ঠাকুরের সম্মুখে একপাশে অনিমেষনেত্রে ভাবগম্ভীর নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। তখন ক্ষেত্রীর মহারাজা প্রভৃতি সকলেই স্বামীজীর আদর্শ অনুসরণ করিয়া লুটাইয়া গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। সকলের প্রণাম হইয়া গেলে স্বামীজী ক্ষেত্রীর মহারাজাকে পঞ্চবটীর দিকে লইয়া চলিলেন।

''পঞ্চবটীর তলায় আসিয়া স্বামীজী অপূর্ব ভাবে বিভোর হইলেন। পঞ্চবটী প্রদক্ষিণ করিয়া একটু ধ্যানস্থ হইয়া বসিলেন। পরে বালকের মতো আনন্দে পঞ্চবটীর একটি ডালে বসিয়া ঝুলিতে লাগিলেন। মহারাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ছিলেন, তখন আমরা এই রকম গাছে দোল খেতাম, আনন্দ করতাম। আজ সেই কথা স্মৃতিপথে উদিত হচ্ছে। দেখ, এই গঙ্গাতীরে কী অপূর্ব দৃশ্য, কী সুন্দর পরিবেশ!' পরে সকলেই সেখানে স্বামীজীর সঙ্গে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্বামীজী উঠিয়া পড়িলেন। পুনরায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের উত্তর দিকে সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

''সেই সময় শ্রীযুক্ত রামলাল-দাদা প্রভৃতি পুরোহিতগণ নারিকেলে পৈতা জড়াইয়া স্বস্তিবাচন পাঠ করিয়া মহারাজা শ্রীঅজিত সিংকে পুষ্পমাল্য-সহ নারিকেল অর্পণ করিলেন। তিনিও নতমস্তকে উহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। এমন সময় একটি সুন্দর গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ যুবক আসিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। স্বামীজী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'কি রে তোর বাবা কোথায়?' বালক উত্তর করিল, 'কুঠীঘরের বৈঠকখানায় বসে আছেন।'—'তোর বাবা এল না কেন?' বালক নিরুত্তর রহিল। স্বামীজী ইহা বলিয়া মহারাজাকে সঙ্গে লইয়া গাড়িতে আলমবাজার মঠের দিকে চলিয়া গেলেন। শুনিলাম, বালকটি ত্রৈলোক্য বিশ্বাসের পুত্র।''[৫৮]

মন্দিরের মালিক ত্রৈলোক্য বিশ্বাস কুঠিবাড়ির বৈঠকখানায় বসে ছিলেন। তিনি স্বামীজী বা ক্ষেত্রীর রাজাকে সংবর্ধনা করলেন না। কর্তৃপক্ষের এই আচরণের দ্বারা পরোক্ষভাবে স্বামীজীকে জানানো হল যে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর আগমন বাঞ্ছনীয় নয়। এটিই ছিল স্বামীজীর শেষ আগমন।

স্বামীজী কেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে অবাঞ্ছিত হলেন—তা বিস্তারিতভাবে শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন। ত্রৈলোক্য বলেন, ''যে ব্যক্তি বিদেশে যাওয়া সত্ত্বেও নিজেকে হিন্দু বলিতে পারে—এমন কাহারও সহিত আমার বিন্দুমাত্র

সম্পর্ক থাকা উচিত বলিয়া আমি বিবেচনা করি নাই।"[৫৯] শুধু তাই নয়, বিবেকানন্দ মা কালীকে দর্শন করেছেন, সেহেতু প্রতিমা অপবিত্র হয়ে গেছে এবং তাকে পুনরভিষেক করা হয়েছে। কৈবর্ত রাসমণির প্রতিষ্ঠিত কালীকে কোনও ব্রাহ্মণ পূজা বা অন্নভোগের বিধান দিলেন না, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অগ্রজ রামকুমার বিধান দিলেন। সেই দেবীকে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার দ্বারা জাগ্রত করলেন আর সেই শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দকে—যিনি সারা বিশ্বে হিন্দুধর্ম প্রচার করলেন—রাসমণির দৌহিত্র ত্রৈলোক্য তাঁকে জাতিচ্যুত করলেন।

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের দ্বার স্বামীজীর জন্য বন্ধ হওয়ার আর একটি বিশেষ কারণ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল 'রামকৃষ্ণ লীলামৃতে' লিখেছেন :

''জগৎমান্য স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যা-সাহেব-মেমসহ উৎসবে যোগদান করায় মন্দিরাধীশদের আশঙ্কা হয় যে, পাছে এই সকল কারণে এবং ইঁহাদের প্রচেষ্টায় তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি পরস্ব অর্থাৎ সাধারণের হয়।"[৬০]

শঙ্করীপ্রসাদ লিখেছেন,

''দক্ষিণেশ্বর ব্যাপারটি হাতে পেয়ে উল্লাসে ফেটে পড়েছিল ক্রীশ্চান মিশনারিরা। এতদিন যথেষ্ট চেষ্টা করেও বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উপযুক্ত ফললাভ হয়নি, যেটুকু হয়েছে, পরিশ্রমের তুলনায় তা কিছুই নয়। আরো কিছু চাই—একেবারে মুখের মতো—সহসা তা হাতে এসে গেল—তাঁরা খবর পেলেন—দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে ভ্রষ্ট হিন্দু বলে বিবেকানন্দকে বিতাড়িত করা হয়েছে। এ তো সুযোগ নয়—সুবর্ণ সুযোগ!! ওহ্ ক্রাইস্ট!!! হিন্দুধর্মের আচার্যরূপে কথিত লোকটি হিন্দু-মন্দির থেকে বিতাড়িত, জাতিচ্যুত, অসম্মানিত—বাহবা কী আনন্দ! অপূর্ব প্রচার-উপাদান! সুতরাং অবিলম্বে এই সংবাদ আমেরিকায় পৌঁছে দেওয়া হল—আমেরিকার পত্র-পত্রিকা পূর্ণ হয়ে উঠল তার দ্বারা। তা পড়ে স্বামীজীর সুহৃদ্-সজ্জনেরা উদ্বিগ্ন হয়ে ব্যাপারটা কী জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন।"[৬১]

এ-ব্যাপারে স্বামীজীর প্রতিক্রিয়া?—'ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ'—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করতে পারে না। যাহোক, স্বামীজী ৯ জুলাই ১৮৯৭ আলমোড়া থেকে মেরি হেলের পত্রের উত্তরে লিখলেন,

''আমি অনেকগুলি আমেরিকান কাগজের কাটিংস পেয়েছি... তাতে অদ্ভুত খবর পেলাম, আমি এখানে জাতিচ্যুত হয়েছি। আমি সন্ন্যাসী—আমার আর জাত হারাবার ভয়!

''জাত তো যায়ই নি, উল্টোদিকে সমুদ্রযাত্রার উপর সমাজের যে-একটা বিরুদ্ধভাব ছিল, আমার পাশ্চাত্ত্য গমনের জন্য তা বহুল পরিমাণে বিধ্বস্ত হয়েছে। আমাকে যদি জাতিচ্যুত করতে হয়, তাহলে আমার সঙ্গে ভারতের অর্ধেকসংখ্যক দেশীয় রাজা এবং প্রায় সকল শিক্ষিত ব্যক্তিকে জাতিচ্যুত করতে হবে। অপরপক্ষে আমার সন্ন্যাসপূর্ব জাতির একজন প্রধান রাজা আমার সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন তাতে ঐ জাতির বাঘা বাঘা লোকেরা যোগ দিয়েছিলেন।... প্রিয় মেরী, রাজবংশধররা এই পা ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়েছে, পূজা করেছে—আর সমস্ত দেশের উপর দিয়ে আদর-অভ্যর্থনার স্রোত বয়ে গেছে, ভারতে তেমন আর কারো জন্য হয়নি। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, রাস্তায় বেরুতে গেলে এমন ভিড় হত যে, শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের দরকার হত—জাতিচ্যুত করাই বটে।"[৬২]

এই উপরিউক্ত কাহিনি আমাদের জানিয়ে দেয় কেন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব তাঁর লীলাভূমি থেকে বেলুড়ে স্থানান্তরিত হল। রামকৃষ্ণ মঠ আলমবাজার থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ বেলুড় নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। ৩ ফেব্রুয়ারি বেলুড় মঠের জন্য জমি বায়না করা হয়

এবং ৫ মার্চ রেজিস্ট্রি করা হয়। ৩৯,০০০ টাকায় দুটি ছোট বাড়ি সমেত ২২ বিঘা জমি কেনা হয় পাটনানিবাসী ভাগবতনারায়ণ সিংয়ের কাছ থেকে। ওই কালে স্বামীজী প্রায় প্রতিদিন মঠের জমিতে বেড়াতে যেতেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন,

''একদিন সকালে স্বামীজীর সহিত আমি এই মঠে বেড়াইতে আসি। এখানে আসিয়া, প্রথমেই তিনি এই জমির গঙ্গাতীরের দক্ষিণ সীমানায় দাঁড়াইয়া আমাকে বলিলেন, 'দ্যাখ, এই জমির Frontageটা (গঙ্গাতীরের সম্মুখভূমি) দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর চেয়ে বড়। এই গঙ্গার ধারেই যখন আবার পোস্তা তৈরী হবে তখন লম্বায় কালীবাড়ীকেও হার মানিয়ে দেবে—না?' আমিও তখনি তাঁহার কথায় সায় দিলাম। তারপর বলিলেন, 'দ্যাখ, কালীবাড়ী-ওয়ালারা এ বছর কালীবাড়ীতে, আমাদের উৎসব করতে দিলেনা। তাতে আমার মনে হয়, একদিকে ঠাকুর ভালই করলেন! জানিস্ ত—তোদের ভিতরে আবার এমন অনেক আছে—যারা এই মঠে মহোৎসব করবার বিপক্ষে নানাপ্রকার ওজর আপত্তি তুলত। দেখতে গেলে ওরাও আমাদের এক রকমে ভালই করেছে।' এই কথা বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।''[৬৩]

স্বামীজী ঋষি ছিলেন। তাঁর বাক্য বিফল হওয়ার নয়। এখন নীলাম্বরবাবুর বাড়ি থেকে জল পরিশোধনের স্থান পর্যন্ত বেলুড় মঠের এই দীর্ঘ পোস্তা দক্ষিণেশ্বরের পোস্তার দ্বিগুণ হবে বলে মনে হয়।

১৮৯৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয় নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে। এদিনের বিবরণ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বিস্তারিতভাবে স্বামি-শিষ্য-সংবাদে লিখেছেন :

''জন্মতিথিপূজায় সেবার বিপুল আয়োজন! স্বামীজীর আদেশ মত ঠাকুর-ঘর পরিপাটী দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। স্বামীজী সেদিন স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

''জন্মতিথির সুপ্রভাতে সকলেই আনন্দিত! কেবল ঠাকুরের কথা ছাড়া ভক্তদের মুখে আর কোন কথাই নাই। পূজার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া স্বামীজী এইবার পূজার আয়োজন দর্শন করিতে লাগিলেন।

''পূজার তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, 'পৈতে এনেছিস তো?'

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ। আপনার আদেশ মত সব প্রস্তুত। কিন্তু এত পৈতার যোগাড় কেন, বুঝিতেছি না।

স্বামীজী। দ্বি-জাতিমাত্রেরই উপনয়ন সংস্কারে অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণস্থল। আজ ঠাকুরের জন্মদিনে যারা আসবে, তাদের সকলকে পৈতে পরিয়ে দেব। এরা সব ব্রাত্য (পতিত সংস্কার) হয়ে গেছে। শাস্ত্র বলে, ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করলেই আবার উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি—সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। তাই আজ সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে পৈতে পরাতে হবে।—বুঝলি?

''স্বামীজীর আদেশমত সমাগত প্রায় ৪০।৫০ জন ভক্ত ক্রমে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া, শিষ্যের নিকট গায়ত্রী মন্ত্র লইয়া পৈতা পরিতে লাগিল। মঠে হুলস্থূল। পৈতা পরিয়া ভক্তগণ আবার ঠাকুরকে প্রণাম করিল, এবং স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া স্বামীজীর মুখারবিন্দ যেন শতগুণে প্রফুল্ল হইল। ইহার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষজা মহাশয় মঠে উপস্থিত হইলেন।

''এইবার স্বামীজীর আদেশে সঙ্গীতের উদ্যোগ হইতে লাগিল, এবং মঠের সন্ন্যাসীরা আজ স্বামীজীকে মনের সাধে সাজাইতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল, সর্বাঙ্গে কর্পূরধবল পবিত্র বিভূতি, মস্তকে আপাদলম্বিত জটাভার, বাম হস্তে

ত্রিশূল, উভয় বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয়, গলে আজানুলম্বিত ত্রিবলীকৃত বড় রুদ্রাক্ষমালা প্রভৃতি দেওয়া হইল। ঐ সকল পরিয়া স্বামীজীর রূপের যে শোভা সম্পাদিত হইল, তাহা বলিয়া ফুরাইবার নহে! সেদিন যে যে সেই মূর্তি দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল—সাক্ষাৎ কালভৈরব স্বামী-শরীরে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বামীজীও অন্যান্য সন্ন্যাসীদিগের অঙ্গে বিভূতি মাখাইয়া দিলেন। তাঁহারা স্বামীজীর চারিদিকে মূর্তিমান ভৈরবগণের ন্যায় অবস্থান করিয়া মঠভূমিতে কৈলাসাচলের শোভা বিস্তার করিলেন, সে দৃশ্য স্মরণ করিয়াও এখন আনন্দ হয়!

''এইবার স্বামীজী পশ্চিমাস্যে মুক্ত পদ্মাসনে বসিয়া 'কূজন্তং রামরামেতি' স্তবটি মধুর স্বরে উচ্চারণ করিতে এবং স্তবান্তে কেবল 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' এই কথা পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অক্ষরে অক্ষরে যেন সুধা বিগলিত হইতে লাগিল। স্বামীজীর অর্ধনিমীলিত নেত্র; হস্তে তানপুরায় সুর বাজিতেছে। 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' ধ্বনি ভিন্ন মঠে কিছুক্ষণ অন্য কিছুই আর শোনা গেল না!... প্রায় অর্ধাধিক ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

''এইবার স্বামীজী সহসা নিজে বেশভূষা খুলিয়া গিরিশবাবুকে সাদরে ঐ সকল পরাইয়া সাজাইতে লাগিলেন। নিজহস্তে গিরিশবাবুর বিশাল দেহে ভস্ম মাখাইয়া কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ও বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয় দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু সে সজ্জায় যেন আর এক মূর্তি হইয়া দাঁড়াইলেন; দেখিয়া ভক্তগণ অবাক হইয়া গেল! অনন্তর স্বামীজী বলিলেন, 'পরমহংসদেব বলতেন, ''ইনি ভৈরবের অবতার''।' আমাদের সঙ্গে এঁর কোনও প্রভেদ নেই।''

''স্বামীজী। মাস্টার মহাশয়, আজ ঠাকুরের জন্মদিন। ঠাকুরের কথা আজ আমাদের কিছু শুনাতে হবে।

''মাস্টার মহাশয় মৃদুহাস্যে অবনতমস্তক হইয়া রহিলেন। ইতোমধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় দেড় মণ ওজনের দুইটি পান্তুয়া লইয়া মঠে উপস্থিত হইলেন। অদ্ভুত পান্তুয়া দুইটি দেখিতে সকলে ছুটিলেন। অনন্তর স্বামীজী প্রভৃতিকে উহা দেখান হইলে পর স্বামীজী বলিলেন—'ঠাকুর-ঘরে নিয়ে যা।'

''স্বামী অখণ্ডানন্দকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন—দেখছিস কেমন কর্মবীর! ভয়, মৃত্যু—এ সবের জ্ঞান নাই;—এক রোখে কর্ম করে যাচ্ছে—'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'।''[৬৪]

তথ্যসূত্র

৫৩। স্বামী প্রভানন্দ, *রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪০৮, পৃঃ ৯৯

৫৪। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৭০, পূর্ব কাণ্ড, পৃঃ ৩২-৩৫

৫৫। সম্পাদনা : স্বামী ঋতানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণ : চিন্তনে ও মননে*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৮, পৃঃ ৯৫৩

৫৬। *শঙ্করানন্দ গল্পকথা*, রামকৃষ্ণ-শঙ্করানন্দ আশ্রম, বামুনমুড়া, ১৯৬৬, পৃঃ ১-২

৫৭। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *স্বামী বিবেকানন্দ : নতুন তথ্য নতুন আলো*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৫, পৃঃ ২৮৯-৯০

৫৮। *উদ্বোধন*, ৬২ বর্ষ, পৃঃ ৫২৯-৩০

৫৯। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*, মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৮৫, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৪৩

৬০। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত*, কলকাতা, ১৩৪৩, পৃঃ ২৮৩

৬১। *সমকালীন ভারতবর্ষ*, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৪৬

৬২। তদেব, পৃঃ ১৪৭

৬৩। *উদ্বোধন*, ৩১ বর্ষ, পৃঃ ২৬৫-৬৬

৬৪। *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ*, পূর্ব কাণ্ড, পৃঃ ৫-১১